দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...... 3 JUL 2003..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ......

ব্রিগেঃ জেনারেল গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী বীর বিক্রম, পিএসসি (অবঃ)

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতের রূপরেখা

চাহিদা নেই। কারণ তারাও এমএ ডিগ্রীধারীদের মতোই অতিযোগ্য (Over Qualified) এবং অদক্ষ (Unskilled). যাও অল্পসংখ্যক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছে, তাদের মাসিক বেতন ১৫০০-২০০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এই সকল বিএ ডিগ্রীধারীদের দক্ষ জনশক্তিতে (Skilled manpower) রূপান্তরিত করতে উদ্যোক্তা ও শিল্প মালিকদের ২-৩ বছর লেগে যাচ্ছে। বিএ ডিগ্রী তাদের জন্যও এক অযোগ্যতায় পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মাঝারি ধরনের একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ৫০৬ জন কর্মচারীর মধ্যে বিএ পাস দরকার হচ্ছে বা নিয়োজিত আছে মোট ৪ জন।

এইচএসসি : এইচএসসি লেভেলে আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৪৫,৮১৮ জন যা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ০.৫ ভাগ। জীবনের এই পর্যায়ে কিছু কিছু মেধাবী শিক্ষার্থী প্রকৌশল শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিশেষায়িত শাখায় অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষার মাধ্যমে যাবার সুযোগ পাচ্ছে। তারও খুবই নগণ্যসংখ্যক যাচ্ছে প্রতিরক্ষাবাহিনীগুলোতে। কিন্তু এইচএসসি পাস একটি বিরাট ও মূল অংশই যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ ক্লাসে। একটি বড় অংশ এ পর্যায়ে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সকল এইচএসসি পাস তরুণ-তরুণীরা ও শিল্প-কারখানাগুলোর চাহিদা মেটাতে পারছে না, কারণ তারাও হলো অদক্ষ (Unskilled) যারাও বা চাকরি পাচ্ছে তাদের মাসিক বেতন দাঁড়াচ্ছে ১০০০-১৫০০-এর মধ্যে। তাদের প্রশিক্ষিত করতে ও শিল্প-কারখানাগুলোর ২-৩ বছর সময় লাগছে। দেশে বর্তমানে এইচএসসি পাস বেকারের সংখ্যা ৭ লাখের কাছাকাছি।

এসএসসি: দেশে প্রতি বছর এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪,০৮,৯৬৯ জন এবং এরা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ১.৩২ ভাগ। এসএসসি পাস এই সকল তরুণ-তরুণীর বিপুলসংখ্যকই এইচএসসির সিঁড়ি অতিক্রম করতে পারছে না। যে সকল ভাগ্যবান কাজ পাচ্ছে তাদের মাসিক বেতন হচ্ছে ৮০০-১০০০ টাকা। বর্তমানে এসএসসি পাস বেকারের সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক।

● ● ● ● ●

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটি বস্তুতপক্ষে একটি অতি প্রাচীন, প্রযুক্তি বিযুক্ত, গদবাঁধা ও পশ্চাৎপদ শিক্ষা পদ্ধতি। বাংলাদেশের মতো একটি গণতন্ত্রকামী, উন্নয়নপ্রয়াসী দেশের জন্য এটি কিছুতেই সুফল বয়ে আনতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী, প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তববাদী ও ফলপ্রসূ শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন অপরিহার্য যা শুধু জাতির সুদৃঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক অবকাঠামোই গঠন করবে না; বরং তৈরী করবে একটি সুশৃঙ্খল, কর্ম- প্রয়াসী, দক্ষ, উদ্যমী স্বাবলম্বী জনগোষ্ঠী, যা দেশের কর্ম চাহিদা তো মেটাবেই, বরং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের ভাবমূর্তিকে করবে সমুন্নত।

● ● ● ● ●

৮ম-১০ম শ্রেণীঃ এই সকল শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ (২১৮১৪৭৩); যা মোট শিক্ষার্থীর ৭%। এই গ্রুপটি শ্রম বাজারের জন্য উপযোগী কিন্তু অদক্ষ (suitable but unskilled)। তাদেরকেও প্রশিক্ষণ দিতে ২-৩ বছর লেগে যাচ্ছে। কিন্তু শিল্প-কারখানায় তাদের চাহিদা রয়েছে এই কারণে যে, তারা যে-কোন কাজ করতেই প্রস্তুত এবং তাতেই তাদের কর্ম- সন্তুষ্টি (job satisfaction) রয়েছে। তাদেরও বেতন মাসে ৮০০-১০০০ টাকা। এদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ৪০ লক্ষের উপরে।

৩য়-৭ম শ্রেণীঃ এই সকল শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষের উপরে (১,৩২,১৮৬০৮) যা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৪৩ ভাগ। কল-কারখানায় এদের তেমন চাহিদা নেই, কারণ এদের না আছে তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, না আছে তেমন দক্ষতা (unqualified and unskilled)। যদিওবা তাদের মধ্যে কেউ কেউ চাকরি পাচ্ছে তাদের মাসিক বেতন হচ্ছে ৬০০-৮০০ টাকা। তেমন শিক্ষিত নয় বলে এদের কাজের মানও খুব নিম্ন। এদের মধ্যে ড্রপ আউট (drop out) ও বেকারের সংখ্যা ২ কোটির উপরে।

নিরক্ষর থেকে স্বল্প অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন (০-২য় শ্রেণী): শিল্প-কারখানায় এদের তেমন চাহিদা না থাকলেও শ্রম বাজারে দিন মজুর হিসেবে এদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক তেমন শিক্ষা না থাকার কারণে এদের কোন পিছুটান নেই এবং এদের কর্ম সন্তুষ্টি রয়েছে। এদের দৈনিক মজুরী ৭০-১০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক বেতন ২০০০-৩০০০ টাকা। এদের মধ্যে ৬ কোটির উপরে (৬ কোটি ৬ লক্ষ) বেকার। সারা বছরব্যাপী এদের কর্ম চাহিদা নেই; কিন্তু বিশেষ ঋতু ভেদে চাহিদা রয়েছে।

শুভঙ্করের ফাঁকিঃ উপরোক্ত আলোচনা শেষে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শ্রম বাজারে নিরক্ষর শ্রেণী এবং এমএ ডিগ্রীধারীদের বেতন প্রায় সমমানের। অতএব, সুদীর্ঘ ২৩ বছরের শিক্ষা জীবন এবং প্রতি শিক্ষার্থীর পেছনে অভিভাবকের ৩-৫ লাখ টাকা ব্যয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক বিরাট শুভঙ্করের ফাঁকিতে পরিণত করেছে।

ভবিষ্যৎ অন্ধকার : আমাদের শ্রম বাজার ও শিল্পের এই অবস্থা একটি কৃত্রিম সমস্যা। এই সমস্যাটি ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বৃটিশরা তৈরি করেছিল। আমরা এত বছরেও এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে পারিনি। বিগত ৩২ বছরে বিভিন্ন সরকার এই জরাজীর্ণ ব্যবস্থাটিকে এদিকে-ওদিকে নেড়েছেন মাত্র, সমস্যার গভীরে গিয়ে এ থেকে উত্তরণের প্রয়াস কেউ নেননি। ফলে এটি এমন এক মারাত্মক ও জটিল জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে যে, এ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে গোটা জাতি এক গভীর অন্ধকারে নিপতিত হতে বাধ্য।

জীবনমুখী শিক্ষা : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনমুখী যে সকল পেশা যেমন কৃষি, মৎস্য, পশু- পালন, হস্তশিল্প ইত্যাদি খাতে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসমষ্টি তৈরি করার প্রয়াস নেই বললেই চলে। ফলে এ সকল খাতে আমাদের উন্নয়ন অত্যন্ত নিম্নগামী। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এ অবস্থা দেখা যায়। এমনকি পার্শ্ববর্তী থাইল্যান্ড, মায়ানমার, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশেও এ সকল খাতে বিপুল দক্ষ জনসমষ্টি রয়েছে। ফলে তাদের উৎপাদনের পরিবেশ ও গুণমানের বিরাট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

নিম্নমানের শিক্ষা : যেহেতু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মান প্রতিটি স্তরেই হতাশাব্যঞ্জক, সুতরাং এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যারা বেরিয়ে আসছে তাদের মানও নিম্ন। এরাই আবার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় অবনতিই ক্রমান্বয়ে ঘটছে। ফলতঃ অমেধাবী ও দিক-নির্দেশনাহীন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আবর্তে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশঃ চোরা কাদায় ডুবে যাচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা : উপরোক্ত সমস্যাগুলোকে আরো ঘনীভূত করেছে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমান ধর্মীয় শিক্ষাক্রম মূলতঃ মসজিদের ইমাম এবং মাদ্রাসার শিক্ষক তৈরী করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না, উপরন্তু জাতির স্কন্ধে চাপিয়ে দিচ্ছে কর্মহীন জনগোষ্ঠীর এক বিরাট বোঝা। ২০০১ সালে দাখিল, আলিম, ফাজেল ও কামেল মিলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ লাখ (৩২,৯৯,১০৭) যা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ১১ ভাগ এবং দেশের জনসংখ্যার শতকরা ২.৫ ভাগ। বর্তমান মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দাখিল ও আলিম পাসের যে সনদপত্র প্রদান করা হয় সেটি যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি'র সমমানের বলে গণ্য। কিন্তু আলিম পাসের পর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ফাজেল বা কামেল পাসের যে সনদপত্র ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদান করা হয় তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিগ্রীর সমমানের বলে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নয়। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র/ছাত্রীগণ বিসিএস পরীক্ষাসহ অন্যান্য সরকারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একাধিক কমিটি গঠন করলেও আজ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত আসতে পারেনি।

পণ্যভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ : বর্তমান মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় সেশনজট ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে বিগত ১০ বছরে দেশে গড়ে উঠেছে ৩২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, যেগুলির অধিকাংশেরই রয়েছে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব। শিক্ষা মূলতঃ তৈরী হয়েছে পণ্যে। একে উচ্চ শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ (commercialization of higher education) বলা যায়।

পরীক্ষার ফলাফল : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাসমূহে পাসের হার শতকরা ৩০ ভাগ। ফলে ৭০ ভাগ শিক্ষার্থীই তীব্র হতাশা ও উদ্যমহীন হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা এক্ষেত্রে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত না করে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। ফলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রকারান্তরে দেশ হারাচ্ছে বিরাট সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী এবং অভিভাবকদের ঘটছে নিদারুণ আর্থিক অপচয়।

তদারকিঃ গুণগতমান নির্ধারণ ও গুণগত শিক্ষা প্রদানের কোন তদারকির ব্যবস্থা নেই বিধায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পঠন-পাঠন ও গবেষণা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবর্তে তৈরি হয়েছে টিউটরভিত্তিক শিক্ষার ক্রয়-বিক্রয়। ফলে শিক্ষা তো পণ্যে পরিণত হচ্ছেই, শিক্ষা রূপান্তরিত হয়েছে পরীক্ষা পাসের মাধ্যম হিসেবে। নৈতিক ও আদর্শিক দর্শনহীন এই শিক্ষা কোন কাজেই লাগছে না। দেশের বিদ্যায়তনগুলোকে তাই আর কোচিং সেন্টার থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। (চলবে)

(লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত)